'নৈতিকতা' কি শুধুই বেহেস্তে যাওয়ার পাসপোর্ট?

অভিজিৎ রায়।
www.mukto-mona.com

১

আমার 'বিজ্ঞানময় কিতাবের' প্রত্যুত্তরে লিখিত জনাব আবদুর রহমান আবিদ আর কাজী মশহরুল হুদা সাহেবের প্রবন্ধ দুটি মূলতঃ আমার আজকের লেখার প্রেক্ষাপট। আবিদ সাহেবের ভাষা সাবলিল, বক্তব্য গোছান, আর বিষয় বস্তুর গভীরতাও লক্ষ্যনীয়। তবে তিনি কিছু জিনিস ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি প্রবন্ধ শুরুই করেছেন এই বলে - 'বিশ্বাস সচরাচর সব কিছুরই সহজ সমাধান দেয়। অবিশ্বাসই বয়ে আনে যত জটিলতা।' কথাটি কি পুরোপুরি ঠিক? আমার মনে আছে যে ছোটবেলায় এক ভদ্রলোকের বাসায় যেতাম। জ্ঞানী-গুনি কিন্তু রসিক মানুষ। পেশায় অধ্যাপক। আমার সাথে শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম আর বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খুব আগ্রহ ভরে আলোচনা করতেন। তাঁর বাড়ীর নাম ছিল - 'সংশয়'। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করলাম - 'সংশয় কেন?' উনি উত্তরে হেসে বললেন-'অভি, সংশয়ই হচ্ছে সকল জ্ঞানের উৎস। মানুষ চোখ কান বন্ধ করে যে যা বলেছে তা বিশ্বাস না করে সংশয় প্রকাশ করেছে বলেই আমাদের সভ্যতা আজ এত দূর এগিয়েছে।' সত্যই তাই। ইতিহাসের দিকে তাকানো যাক। টলেমীর 'পৃথিবী-কেন্দ্রিক' মতবাদে কোপার্নিকাস আর গ্যালেলিওরা সংশয় প্রকাশ করতে পেরেছেন বলেই টলেমীর মতবাদ একসময় ভুল প্রমাণিত হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানীরা 'ইথার' নামক কাল্পনিক মাধ্যমটির অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বলেই পরবর্তীতে হাইগেনের তরঙ্গ-তত্ত্ব আর ম্যাক্সয়েলের তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বকে সরিয়ে আলোর প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে পদার্থ-বিজ্ঞানে জায়গা করে নিয়েছে প্লাঙ্ক, আইনস্টাইন আর ব্রগলীর তত্ত্বগুলো। ল্যামার্ক ৬০০০ বছরের পুরনো পৃথিবীর বয়সের বাইবেলের সংস্কারে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন বলেই মিথ্যা বিশ্বাসকে সরাতে পেরেছিলেন মানুষের মন থেকে। এভাবেই সভ্যতা এগোয়। 'মানলে তাল গাছ আর না মানলে গাব গাছ'- আবিদ সাহেবের এই রকম ভাবনা নিয়ে বসে থাকলে আজও বোধ করি সূর্য পৃথিবীর চারিদিকেই ঘুরত। সভ্যতার অনিবার্য গতি আসলে বিশ্বাসের বিপরীতে, যুক্তির অভিমুখে। এ প্রসঙ্গে গৌতম বুদ্ধের একটি চমৎকার উক্তি - Doubt everything, and find your own light.

আবিদ সাহেব আমার বিজ্ঞানময় কিতাবের উত্তরে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তার প্রত্যুত্তরে আমার তেমন কিছু বলবার নেই। কারণ উনি নিজেই স্বীকার করেছেন কোরাণ কোন 'বিজ্ঞানময় কিতাব' নয়। তবে আবার একই সাথে আমি কোরাণকে বিজ্ঞানময় কিতাব বলে যারা মনে করেন তাদের সমালোচনা করায় উনি আমার উপর অযৌক্তিকভাবে বেশ এক হাত নিয়েছেন, সেই সাথে পরিস্কার করেছেন নিজের অবস্থানটুকু। আবিদ সাহেবের মতে কোরাণ কোন বিজ্ঞানময় কিতাব নয়, কোরাণ এসেছে আসলে মানুষের হেদায়েতের জন্য, মানুষকে ইসলামের পথে আনবার জন্য। খুবই ভাল কথা! কোরাণ মানুষকে কতুকু হেদায়েত করছে তা নিয়ে আমি না হয় একটু পরেই আলোচনা করব। 'অবিশ্বাসই বয়ে আনে যত জটিলতা। পৃথিবীর সব মানুষ যদি তার নিজ নিজ ধর্মে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হত এবং মেনে চলত সকল ধর্মীয় অনুশাসন, তাহলে হয়ত শান্তিময় এক পৃথিবীর বাসিন্দা হতে পারতাম আমরা।' - আবিদ সাহেবের এই গুরুত্বপূর্ণ উক্তিটিও বেশ একটু বিশ্লষণের দাবী রাখে। আর মূলতঃ এ নিয়েই আমার আজকের এই প্রবন্ধের প্রস্তাবনা। বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি মশহরুল হুদা সাহেবের আরেকটি লেখার অংশবিশেষের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই-

'শ্রী অভিজিত রায়দের মত ব্যক্তি বর্গ যুগ যুগ ধরে এসেছে এবং ভূত হয়ে চলে গেছে। এদের সম্পর্কে কোরানে উল্লেখ রয়েছে যে, তারা অন্ধ ও বর্বর। এদের হৃদয়ে সীল মোহর এঁটে দেওয়া আছে। তারা কিছুই দেখতে পায়না এবং শুনতে পায়না। শুধু প্রাণীর মত হাম্বা হাম্বা রব তোলে।'

বলতেই হয় হুদা সাহেবের আর তার মহান সৃষ্টিকর্তার রুচিবোধ সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি উনার লেখার উত্তর দিচ্ছি না। কে অন্ধ ও বর্বর আর কে হাম্বা হাম্বা রব তোলে তা নির্ধারণের ভার আমি না হয় আপাততঃ পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

এবার দেখা যাক, আবিদ সাহেব 'পৃথিবীর সব মানুষ যদি তার নিজ নিজ ধর্মে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হত এবং মেনে চলত সকল ধর্মীয় অনুশাসন, তাহলে হয়ত শান্তিময় এক পৃথিবীর বাসিন্দা হতে পারতাম

আমরা।' এই কথাটির মাধ্যমে ধর্মের সাথে নৈতিকতার যে সম্পর্কটি অবলীলায় জুড়ে দিয়েছেন তা আসলে কতটুকু বাস্তব-সম্মত।

প্রাচীনকাল থেকেই ঈশ্বরের প্রতি অগাধ আনুগত্য এবং ধর্ম বিশ্বাসকেই মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের একমাত্র অবলম্বণ বলে মনে করা হয়। আমাদের দেশী কালচার তো আবার এগুলোতে সবসময়ই আবার আরও একধাপ এগিয়ে। শৈশব থেকেই আনেক বাসায় দেখেছি ছোট ছেলে মেয়েগুলোর মাথা বিগড়ে দিয়ে বাংলা শেখার আগেই বাসায় হুজুর রেখে আরবী পড়ানোর বন্দোবস্ত করানো হয়, নয়ত হরি-কীর্তন শেখানো হয় আর নৈতিক চরিত্র গঠনের মূলমন্ত্র হিসেবে তোতা পাখীর মত আউরানো হয় 'অ্যাই বাবু- এগুলো করে না - আল্লাহ কিন্তু গুনাহ দিবে'। ছোটবেলা থেকেই এইভাবে নৈতিকতার সাথে ধর্মের খিঁচুরী একসাথে মিশিয়ে এমনভাবে ছেলে-পিলেদের খাওয়ানো হয় যে তারা বড় হয়েও আর ভাবতেই পারে না যে ধর্ম মানা ছাড়াও কারো পক্ষে ভাল মানুষ হওয়া সম্ভব। কিন্তু সত্যিই কি ধর্মের সাথে নৈতিক চরিত্র গঠনের কোন বাস্তব যোগাযোগ আছে? নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত, কৃষ-লীলা, তবলিগ জামাত ইত্যাদির মাধ্যমে গণ মানুষের নৈতিকতা উন্নয়নের যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, সারা পৃথিবী জুরে ধর্মের নামে মারামারি, হানাহানি, হিংসা, শোষণ, নির্যাতন, দারিদ্র্য আর সন্ত্রাসের বিস্তার দেখে বোঝা যায় যে ঈশ্বরে বিশ্বাস আসলে কোন বিশাল অনুপ্রেরণা হয়ে মানুষের মধ্যে কখনই কাজ করেনি। কারণটা অতি পরিস্কার। ঈশ্বরে বিশ্বাসের মাধ্যমে মরালিটি বা নৈতিকতা অর্জনের চেষ্টা করা আসলে সোজা পথে ভাত না গিলে কানের চারিদিকে হাত ঘুরিয়ে ভাত খাওয়ার মতন। প্রত্যেক ধর্মই বলছে বিধাতা ভাল মানুষকে পুরষ্কৃত করেন আর পাপী-তাপী-নীতিহীনদের শাস্তি দেন। বোঝাই যায় পুরস্কারের লোভটাই এখানে মুখ্য। নৈতিকতা বাদ দিয়ে অন্য যে কোন উপায়ে আল্লাহকে তুষ্ট করে পুরষ্কার বগলদাবা করতে পারলে কোন বান্দাই আর নৈতিকতা-ফৈতিকতার ধার ধারবে না। একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, রাম-নাম, হরিবোল, পাঁঠা বলি, কোরবানী, নামাজ, হজ্জ, কোরাণ তেলাওয়াত, পুজা, যজ্ঞ এই সমস্ত ব্যাপার-স্যাপারগুলোর মাধ্যমে মানুষ আসলে নৈতিকতার কোন ধার না ধেরে বিধাতার তুষ্টি লাভের প্রচেষ্টাতেই মত্ত। মানুষের প্রতি আর সমাজের প্রতি যাদের অবজ্ঞা আর প্রবঞ্চনা বেশী, তারাই কিন্তু বেশী-বেশী 'আল্লা-আল্লা' করে চ্যাঁচায়। হাজী সেলিমের মত পান্ডারই হজ্ব করার প্রয়োজনটা পড়ে বেশী, এরশাদের মত লম্পটেরই 'আলহাজ্ব' হওয়ার শখ হয় প্রবল। কারণ ধর্মেই রয়েছে সমস্ত আ-কাজ, কু-কাজ করেও পার পাবার ঢালাও ব্যবস্থা। মক্কা, জেরুজালেম, পুরী, বারাণসী কি তিরুপতি, এ'সব পবিত্র স্থান দর্শনে রয়েছে জীবনের সব পাপ ধুয়ে গিয়ে পরকালে স্বর্গবাসী হওয়ার নিশ্চন্ত গ্যারান্টি। কোটি টাকার চোরাকারবারী তাই ধুম-ধাম করে পুজা-যজ্ঞ করে নয়ত শেষ বয়সে এলাকায় মন্দির গড়ে দেয় 'সমাজের ভালোর জন্য'।

উপরন্তু, যুক্তি আর বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজ সচেতন মানুষ আজ বুঝতে শিখেছে যে, ঈশ্বর এক অর্থহীন অলীক কল্পণা মাত্র। রাহুল সঙ্কৃত্যায়নের ভাষায়-'অজ্ঞানতার অপর নামই হল ঈশ্বর।' কাজেই অজ্ঞানতাকে পুঁজি করে ঈশ্বর নামক মিথ্যা-বিশ্বাসের মূলা ঝুলিয়ে মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের কাহিনী আজ শিশুতোষ ছড়া ছাড়া কিছুই না।

হুদা সাহেব আমি ধর্ম মানি না বলে আমায় 'অন্ধ' ও 'বর্বর' বলেছেন। সমাজে হুদা সাহেবদের মত লোকজনের অভাব নেই, নাস্তিক শুনলেই তারা খ্যাঁক করে উঠেন - 'ও তুমি নাস্তিক ! তবে তো তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার! তোমার তো চরিত্র বলে কিছু নেই' । হুদা সাহেবদের মত লোকেরা আসলে নাস্তিকদের মানুষ বলেই মনে করেন না, ভাল-মানুষ ভাবা তো আনেক পরের কথা। নাস্তিক মানেই কি আনৈতিক, চরিত্রহীন, লম্পট গোছের কিছু? না মোটেই তা নয়। নাস্তিকরা আসলে নাকের সামনে থেকে ঈশ্বর নামক মুলাটি সরিয়ে বাস্তবসম্মত ভাবে 'মরালিটি' বা নৈতিকতা কে দেখবার পক্ষপাতি। ঈশ্বরের ভয়ে নয়, একটি সুন্দর এবং সুস্থসমাজ গড়ে তুলবার প্রয়োজনেই মানুষের চুরি-দারি, লাম্পট্য, খুন, ধর্ষণ বিসর্জন দিয়ে সামাজিক মূল্যবোধগুলি গড়ে তোলা দরকার। নয়ত সমাজের ভিত্তি-মূলই যে একসময় ধ্বসে পড়বে! কাজেই নাস্তিকদের চোখে 'নৈতিকতা' বেহেস্তে যাওয়ার কোন পাসপোর্ট নয়, বরং নিতান্তই সামাজিক আবশ্যকতা। ধর্মান্ধরা যেহেতু সামাজিক-মূল্যবোধের এই বিষয়গুলো একেবারেই বুঝতে চান না, তাই তাদের মধ্যে যুদ্ধ, দাঙ্গা, জিহাদ, মারামারি লেগেই আছে। ১৯৭১ সালের কথাই ধরা যাক। সারা বাংলা হত-বিহ্বল হয়ে দেখেছে কিছু ধর্মান্ধ মানুষ ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে কি করে পশুর স্তরে নেমে যেতে পারে। আজ গোলাম আযম সাহেব সংখ্যালঘুদের দুঃখে কাতর হয়ে পাতার পর পাতা (ভিন্নমতে) লিখে যাচ্ছেন। অথচ এই ব্যক্তিটিই তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে ১৯৭১ সালে সংখ্যালঘুদের কচুকাটা করেছিলেন। কেন? স্রেফ ধর্মের প্রতি ভালবাসায় অন্ধ হয়ে। উনি ভেবেছিলেন পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলে ইসলাম হবে বিপন্ন। এই কিছুদিন আগে গুজরাটে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দাঙ্গা, আর বছর ক'য়েক আগে অযোদ্ধায় বাবরী মসজিদ ভেংগে শিবসেনাদের তান্ডব নৃত্য ধর্মের এই ভয়াবহ রূপটিকেই স্মরণ করে দেয়। আপরপক্ষে নাস্তিকদের যেহেতু এই অতি মানবিক সত্ত্বা-কেন্দ্রিক নৈতিকতায় কোন বিশ্বাস নেই, একজন নিষ্ঠাবান নাস্তিক সত্যিকার অর্থে গড়ে

ওঠেন একজন যথার্থ প্রথা-বিরোধী মানুষ হিসেবে। সুমন তুরহান নামে এক লেখক মাসিক দেশ পত্রিকার ৪ নভেম্বর ২০০2 সংখ্যায় ‘নাস্তিকতার সংজ্ঞা’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন - ‘নাস্তিকদের অবিশ্বাস তাই শুধু অতিমানবিক সত্তায় নয়, তার চেয়ে অনেক গভীরে, তিনি অবিশ্বাস করেন প্রথাগত সভ্যতার প্রায় সমস্ত অপবিশ্বাসে । সব কিছুই তিনি যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখতে চান।’ (১) তাই নাস্তিকদের মধ্যে থেকে কখনো তালিবান, হরকত-উল-জিদাদ, রাজাকার, আলবদর বা শিব সেনাদের মত সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক রূপ দেখা যায় না। যতদিন ধর্ম থাকবে, ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকবে ধর্মের সাম্প্রদায়িক এই সাংগঠনিক রূপটিও কিন্তু বজায় বজায় থাকবে পুরোমাত্রায়। কাজেই যতদিন মানুষের আনুগত্য ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে বিভক্ত হয়ে থাকবে ততদিন তা মানুষকে স্বাধীনভাবে আর বিজ্ঞানসম্মতভাবে নৈতিকতা ও মুল্যবোধ অর্জনে বাঁধা দিবেই। বেহেস্তের লোভে বা ঈশ্বরকে তুষ্ট করার জন্য নয়, মানুষকে ভালবেসে মানুষের জন্য কাজ করার প্রচেষ্টা যদি আন্তরিক হয়, তবেই গড়ে উঠবে সার্বজনীন মানবতাবাদ । সম্প্রতি এর প্রচেষ্টা শরুও হয়েছে । ঈশ্বর কেন্দ্রিক মিথ্যার বেসাতি মন থেকে সরিয়ে শুধুমানুষের জন্য মানুষের কাজ করার বাসনা নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে জুড়ে নতুন শতকের আধুনিক মতবাদ হিসেবে এসেছে হিউম্যানিজম। এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও হিউম্যানিস্টরা অফিস আদালতের ফর্মে বা বিয়ের রেজিস্ট্রেশনে ‘হিন্দু’ ‘মুসলিম’ এই শব্দ গুলির পাশাপাশি ধর্মের জায়গায় ‘মনুষ্যত্ব’ শব্দটি ব্যবহারের আইনি অধিকার আদায় করেছে। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষের একটি চমৎকার উক্তি মনে পড়ছে (২) -

‘আগুনের ধর্ম যেমন দহন, ছুঁড়ির ধর্ম যেমন তীক্ষ্ণতা তেমনি মানুষের ধর্ম হওয়া উচিত মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন। আর সে হিসেবে নামাজ না পড়েও বা শনি শীতলার পুজা না করেও আমরা যুক্তিবাদী নাস্তিকেরাই প্রকৃত ধার্মিক, কারণ আমরা মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ চাই।’

২

হুদা সাহেবদের চিন্তাধারা হয়ত প্রাগৈতিহাসিক আমলে পড়ে আছে। এরা নতুন কিছু বুঝতেও চান না, শিখতেও চান না। এরা সবসময় ধর্মগ্রন্থের মধ্যেই নাক মুখ গুজে নৈতিকতার সন্ধান করেন, আর কেউ ধর্ম না মানলেই (তাদের ভাষায়) তারা ‘হাম্বা হাম্বা’ রব তোলে। কিন্তু ধর্মগ্রন্থগুলো আসলে কি ধরনের নৈতিকতা শিখাচ্ছে? কোরাণের কথাই ধরা যাক। কোরাণ মুমিন ভক্তদের শেখাচ্ছে যেখানেই অবিশ্বাসীদের পাওয়া যাক তাদের হত্যা করতে (সূরা ২:১৯১, ৯:৫), তাদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হতে, কঠোর ব্যবহার করতে (সূরা ৯:১২৩), আর যুদ্ধ করে যেতে (সূরা ৮:৬৫)। কোরাণ শেখাচ্ছে বিধর্মীদের অপদস্ত করতে আর তাদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করতে (সূরা ৯:২৯)। কোরাণ অন্য সকল ধর্মের অনুসারীদের কাছ থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার নির্যাসটুকু কেড়ে নিয়ে সোচ্চারে ঘোষণা করছে যে ইসলামই হচ্ছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম (সূরা ৩:৮৫)। এটি অবিশ্বাসীদের দোজখে নির্বাসিত করে (সূরা ৫:১০), এবং ‘অপবিত্র’ বলে সম্বোধন করে (সূরা ৯:২৮); মুসলিমদের ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আদেশ করে যত ক্ষণ পর্যন্ত না অন্য সকল ধর্মকে সরিয়ে ইসলামী রাজত্ব কায়েম হয় (সূরা ২:১৯৩)। কোরাণ বলছে যে শুধু ইসলামে অবিশ্বাসের কারণেই একটি মানুষ দোজখের আগুনে পুড়বে আর তাকে সেখানে পান করতে হবে পুঁতি দুর্গন্ধ ময় পূঁজ (সূরা ১৪:১৭)। এই ‘পবিত্র’ গ্রন্থটি অবিশ্বাসীদের হত্যা করতে অথবা তাদের হাত পা কেটে ফেলতে প্ররোচিত করছে, দেশ থেকে আপমান করে নির্বাসিত করতে বলছে আর ভয় দেখাচ্ছে এই বলে যে- ‘তাদের জন্য পরকালে অপেক্ষা করছে ভয়ানক শাস্তি’ (সূরা ৫:৩৪)। আরও বলছে, ‘যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে যাতে ওদের চামড়া আর পেটে যা আছে তা গলে যায়, আর ওদের পেটানোর জন্য থাকবে লোহার মুগুর’ (সূরা ২২:১৯)। (৩) কী ভয়ানক!

কোরাণ ইহুদী এবং নাসারাদের সাথে বন্ধুত্বটুকু করতে পর্যন্ত নিষেধ করছে (সূরা ৫:৫১), এমনকি নিজের পিতা বা ভাই যদি আবিশ্বাসী হয় তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখতে উদ্বুদ্ধ করছে (সুরা ৯:২৩, ৩:২৮)। আল্লাহ তার কোরাণে পরিস্কার করেই বলছে - আল্লা-রসুলে যাদের বিশ্বাস নেই, তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড (সূরা ৪৮:১৩)। ইসলামে অবিশ্বাস করে কেউ মারা গেলে কঠোর ভাবে উচ্চারিত হবে - ‘ধর ওকে, গলায় বেড়ি পড়াও এবং নিক্ষেপ কর জাহান্নামে আর তাকে শৃংখলিত কর সত্তুর হাত দীর্ঘ এক শৃংখলে’ (সুরা ৬৯:৩০-৩৩)। মহানবী সবসময়ই আল্লাহর নামে যুদ্ধ করতে সবাইকে উৎসাহিত করেছেন সাফাই গেয়েছেন এই বলে - ‘এটা আমাদের জন্য ভালই, এমনকি যদি আমাদের অপছন্দ হয় তবুও’ (সুরা ২:২১৬), তারপর উপদেশ দিয়েছেন - ‘কাফেরদের গর্দানে আঘাত কর’ আর তারপর তাদের উপর রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবার নির্দেশের পর বলেছেন অবশিষ্টদের ভালভাবে বেঁধে ফেলতে (সুরা ৪৭:4)। পরমকরুনাময় আল্লাহতালা এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন - ‘কাফেরদের হৃদয়ে আমি গভীর ভীতির সঞ্চার করব’ এবং বিশ্বাসীদের আদেশ করেছেন কাফেরদের কাঁধে আঘাত করতে আর হাতের সমস্ত আংগুলের ডগা ভেঙ্গে দিতে (সূরা ৮:১২)

আল্লাহ জ্বিহাদকে মুমিনদের জন্য ‘আবশ্যিক’ (mandatory) করেছেন আর সতর্ক করেছেন এই বলে - ‘তোমরা যদি সামনে না এগিয়ে আস (জ্বিহাদের জন্য) তবে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে মর্মন্তুদ শাস্তি’(সুরা ৯:৩৯)। আল্লাহ তার পেয়ারা নবীকে বলছেন, ‘হে নবী, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর আর কঠোর হও- কেননা, জাহান্নামের মত নিকৃষ্ট আবাস স্থলই হল তাদের পরিনাম’ (সুরা ৯:৭৩)। (৪)

এই হচ্ছে কোরাণ। আবিদ সাহেব, ফরিদ সাহেব আর হুদা সাহেবদের ‘The book of guidence’। আবিদ সাহেব যে বলছেন ‘বিশ্বাস সচরাচর সব কিছুরই সহজ সমাধান দেয়’ - কখনও কি তিনি ভেবে দেখেছেন যে উপরের আয়াতগুলো যারা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে আর সমাজে তার বাস্তব প্রয়োগ চায় তারা কি ধরনের ‘শান্তি’ এ পৃথিবীতে বয়ে আনছে? সহজ সমাধানই পাচ্ছি বটে আমরা! আজকের বিশ্বে ‘Islamic Terroism’ একটি প্রতিষ্ঠিত শব্দ। প্রতিদিন কাগজের পাতা খুললেই দেখা যায় এই জ্বিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ কিছু লোক বোমা মারছে মানুষ-জন, বাড়ী-ঘর, কারখানা, রাস্তাঘাট, যান-বাহন, সিনেমা হল, সাংস্কৃতিক অঙ্গন বা সমুদ্র-সৈকতে। হাজার খানেক জ্বিহাদী সংগঠন যেমন - ইসলামিক জ্বিহাদ, হামাস, হরকত-উল-জিহাদ, হরকত-উল-মুজাহিদিন, জেইস-মুহম্মদ, জ্বিহাদ-এ-মুহম্মদ, তাহ-রিখ-এ-নিফাজ-সারিয়াত-এ-মুহম্মদ, আল-হিকমা, আল-বদর-মুজাহিদিন, জামায়ে ইসলামিয়া, হিজাব-এ-ইসলামিয়া আজ সারা পৃথিবী জুড়ে কায়েম করছে এক ত্রাসের রাজত্ব। কখন ও কি আবিদ আর হুদা সাহেবরা ভেবে দেখেছেন, কেন এই দলগুলো এত ইসলামিক? কেন তারা সন্ত্রাসী? কারা ধীরে ধীরে গড়ে তুলছে মোল্লা ওমর, বিন-লাদেন, মৌলানা মান্নান, গোলাম আজমদের? কে ইন্ধন যোগাচ্ছে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে? আবিদ সাহেবরা মানতে চাইবেন না জানি; কিন্তু এর উত্তর হচ্ছে পরম করুণাময় আল্লাহর মহান বাণী, ‘The book of guidence’- ‘কোরাণ’ এবং মুহম্মদের উপদেশ সমৃদ্ধ কিতাব- ‘হাদিস’। আজ অত্যন্ত পরিস্কারভাবে তাই বলার সময় এসেছে - এই ‘পবিত্র’ ধর্মগ্রন্থগুলোই আসলে মুসলিমদের ধর্মীয় সন্ত্রাস-বাদের মূল উৎস।

হুদা সাহেবরা হয়ত বলবেন যে শুধু গুটি কয়েক সন্ত্রাসীদের কারণে সামগ্রিক ভাবে ইসলামকে বা মুসলীমদের দায়ী করা কি ঠিক হচ্ছে ? এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে আমি কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম জনগোষ্ঠিকে কখনওই সন্ত্রাসী বলছি না, আর বলবই বা কেন; আমার নিজের ই তো অনেক মুসলিম বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। তাদের কেউ ই তো সন্ত্রাসী নন। আবিদ সাহেবে দের মতই তারা ‘ইসলাম-মনা’। তারা আমার বিপদে আপদে খোঁজ-খবর নেন, বাসায় এসে গল্প-গুজব করেন, খাওয়া-দাওয়া করেন, এমন কি নামাজের সময় হলে এই কাফিরের বাসায় ‘পশ্চিম দিক কোনটা’ জানতে চেয়ে নামাজও পড়েন। এরা নিপাট ভাল মানুষ। আবিদ সাহেবের মতই তারা ‘Spiritual Islam’ এর চর্চা করেন। বিপদটা কখনই এদের নিয়ে নয়। কিন্তু এই দলের বাইরেও একটা অংশ রয়েছে যারা রীতিমত কোরাণের চর্চা করেন, চোখ-কান বন্ধ করে কোরানের সকল আদেশ-নির্দেশ মেনে চলেন আর কোরাণের আলোকে দেশ ও পৃথিবী গড়তে চান। বিপদটা এদের নিয়েই। আমি জানি আবিদ সাহেব নিজে ভাল মানুষ। উনি শান্তি, ভালবাসা আর সহিষু-তায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু প্রশ্ন হল এই মূল্যবোধগুলো তিনি ইসলাম থেকে পেয়েছেন, নাকি ছোট বেলা থেকেই সামাজিক শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন? কোনদিন কোরাণের বা ইসলামের চর্চা না করেও তো বহু মানুষ এই গুনাবলীগুলো বর্জিত নয়, এমন প্রমাণ তো তিনি তার চারপাশে চোখ রাখলেই দেখতে পাবেন। কিন্তু আবিদ সাহেব যদি সামাজিক শিক্ষার বদলে কোরানের সকল আদেশ-নির্দেশ চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতেন তাহলে কি হত ? নীচের আয়াত টায় চোখ বুলানো যাক (৫) -

Let not the believers Take for friends or helpers Unbelievers rather than believers: if any do that, in nothing will there be help from Allah (Q. 3:28)

আবিদ সাহেব কি তার কোন হিন্দু, খ্রীস্টান বা অধার্মিক প্রতিবেশীদের প্রতি কোরাণে বর্ণিত উপরের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করেন? তিনি কি সত্যই শুধুমাত্র অমুসলিম বলেই কারো বন্ধুত্ব প্রত্যাখান করেন? যদি তা না হয়, তবে বলতেই হয় যে তিনি আসলে কোরাণের নির্দেশ অনুযায়ী চলছেন না। কিন্তুকোরাণ তো আল্লাহর কিতাব। যদি কেউ আবিদ সাহেবের মত ‘Spiritual Islam’ এর চর্চা না করে কোরাণের নির্দেশ আক্ষরিক ভাবেই মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেন আর অবশেষে সাম্প্রদায়িক ‘তালিবান’ হিসেবে বেড়ে উঠেন, তবে দোষটা কার বলে আবিদ সাহেব ভাবছেন?

আরেকটি আয়াত দেখি (৫) -

Fighting is prescribed for you, and ye dislike it. But it is possible that ye dislike a thing which is good for you (Q. 2:216)

অথবা,

Then fight in Allah's cause - Thou art held responsible only for thyself - and rouse the believers. It may be that Allah will restrain the fury of the Unbelievers; for Allah is the strongest in might and in punishment (Q. 4:84).

আবিদ, হুদা সাহেবরা কি বলবেন? উনারা কি কোরাণের নির্দেশ মত জ্বিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে তালিবানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইহুদী-নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য আফগানিস্তান চলে গিয়েছিলেন? বোধ হয় না। কিন্তু কেউ যদি ইসলামকে নাফরমানদের হাত থেকে রক্ষার জন্য আফগানিস্তান চলে যায় তবে কি খুব দোষ দেওয়া যাবে? এমনি একজন ব্যক্তির উদাহরণ হচ্ছে John Phillip Walker Lindh (transformed as Abdul Hamid)- the famous American TALIBAN. আবিদ সাহেবরা কি সত্যই মনে করেন না যে, কোরাণের অমানবিক শিক্ষাই আমাদের মত 'কাফিরদের' বিরুদ্ধে অযথা হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানোতে বহুলাংশে দায়ী? এই তো মাত্র এক বছর আগে ৯/১১ এর ঘটনায় সারা পৃথিবী স্তম্ভিত হয়ে দেখল কি করে কিছুইসলামী সৈনিক উড়োজাহাজকে অস্ত্র বানিয়ে World Trade Center এ হাজার হাজার নিরপরাধ লোকের প্রাণহানি ঘটাতে পারে। আবিদ সাহেবরা হয়ত বলবেন, এগুলো কতিপয় পথভ্রষ্ট দুষ্কৃতকারীদের কাজ - যার সাথে প্রকৃত ইসলামের সাথে কোন ই সম্পর্ক নাই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই 'কতিপয় পথভ্রষ্ট দুষ্কৃতকারী'রা তো আর নিজেদের দুষ্কৃতকারী ভাবেনি। তারা ভেবেছে তারাই বরং সাচ্চা মুসলিম, যারা কিনা আল্লাহর দেওয়া অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে। নিউজ উইকের ১১ই জানুয়ারী, ১৯৯৯ এর সংখ্যায় ওসামা বিন লাদেনের একটা সাক্ষাতকার ছাপা হয়েছিল। সেই সাক্ষাতকারে লাদেন সাহেব পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন কেন তিনি সকল আমেরিকানদের মেরে ফেলাকে জায়েজ মনে করেন। পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছুঅংশ তুলে দেওয়া হল (৬) -

QUESTION: "Why have you asked Muslims to target civilian Americans all over the world? Islam prohibits its followers from killing civilians in war?"

BIN LADEN: "If the Israelis are killing small children in Palestine and the Americans are killing the innocent people in Iraq, and if the majority of the American people support their dissolute president, this means the American people are fighting us and we have the right to target them.

QUESTION: "All Americans?"

BIN LADEN "Muslim scholars have issued a fatwa [a religious order] against any American who pays taxes to his government. He is our target, because he is helping the American war machine against the Muslim nation.

হিন্দু ধর্মকে ইসলাম থেকে কোন অর্থেই ভাল বলবার জো নেই। যে জাতিভেদ প্রথার বিষ-বাষ্প প্রায় তিন হাজার বছর ধরে কুড়ে কুড়ে ভারতকে খাচ্ছে তার প্রধান রূপকার সয়ং ঈশ্বর। মনুসংহিতা থেকে আমরা পাই- মানুষের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর নিজের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য, আর পা থেকে শুদ্র সৃষ্টি করেছিলেন (১:৩১)। বিশ্বাসীরা জোর গলায় বলেন, ঈশ্বরের চোখে নাকি সবাই সমান! অথচ, ব্রাহ্মণদের মাথা থেকে আর শুদ্রদের পা থেকে তৈরী করার পেছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যটি কিন্তু বড় ই মহান! শুদ্র আর দলিত নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের প্রতি তাই 'ঈশ্বরের মাথা থেকে সৃষ্ট উঁচু জাতের' ব্রাহ্মণদের দুর্ব্যবহারের কথা সর্বজনবিদিত। সমস্ত বড়লোকের বাসায় এখনও দাস হিসেবে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নিয়োগ দেয়া হয়। মনু বলেছেন- দাসত্বের কাজ নির্বাহ করার জন্যই বিধাতা শুদ্রদের সৃষ্টি করেছিলেন (৮:৪১৩)। এই সমস্ত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বাসার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে চলে যাওয়ার পর গঙ্গা-জল ছিটিয়ে গৃহকে 'পবিত্র' করা হয়। আর হবে নাই বা কেন ! তারা আবার মানুষ নাকি? তারা তো অচ্ছুৎ! শ্রী এম.সি.রাজার কথায়, 'আপনি বাড়ীতে কুকুর-বিড়ালের চাষ করতে পারেন, গো-মুত্র পান করতে পারেন, এমনকি পাপ দূর করার জন্য সারা গায়ে গোবর লেপতে পারেন, কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ছায়াটি পর্যন্ত আপনি মারাতে পারবেন না' (৭)! এই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের নৈতিকতা! এমন কি হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিতে শুদ্রদের উপার্জিত ধন সম্পত্তি তাদের ভোগের ও অধিকার নেই। সব উপার্জিত ধন দাস-মালিকেরাই গ্রহণ করবে -এই ছিল মনুর বিধান - 'ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিত স্বং ভর্তৃহার্যধনো হি সঃ' (৮:৪১৬)। শুদ্ররা ছিল বঞ্চণার করুনতম নিদর্শন; তাদের না ছিল নাগরিক অধিকার, না ছিল ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক অধিকার। শুদ্রদের যাতে অন্য তিন বর্ণ থেকে আলাদা করে চেনা যায় এবং শুদ্ররা যেন প্রতিটি মুহূর্তে মনে রাখে যে তিন বর্ণের মানুষের ক্রীতদাস হয়ে সেবা

করবার জন্যই তাদের জন্ম। তিন বর্ণের মানুষদের থেকে শুদ্ররা যে ভিন্নতর জীব, মনুষ্যেতর জীব তা জানানোর জন্য প্রতি মাসে মাথার সব চুল কামিয়ে ফেলবার নির্দেশ দিয়েছেন মনু (৫:১৪০)। (৮)

আসলে এই সব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম আদিম মানুষের সাম্যের সমাজকাঠমোর ভিত উপড়ে ফেলে প্রতিষ্ঠা করেছিল অসাম্যের সমাজের, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের। ধর্মই তৈরী করেছিল হুজুর-মুজুর শ্রেনীর কৃত্রিম বিভাজনের; প্রতিষ্ঠা করেছিল সামাজিক আর অর্থনৈতিক শোষণের। এই শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবার জন্যই ব্রাহ্ম ণেরা প্রচার করেছিল - ধর্মগ্রন্থগুলো সয়ং ঈশ্বরের মুখ-নিসৃত। মানুষে মানুষে বিভেদ নাকি ঈশ্বর-নির্দেশিত ! ঈশ্বরকে সাক্ষী মেনে রাজনৈতিকভাবে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত সুদুরপ্রসারী প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় উপমহাদেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলে।

ইসলামী জ্বিহাদী সৈনিকদের মতই ভারতে বিভেদের হাতিয়ার 'সনাতন ধর্ম' রক্ষায় আজ সচেষ্ট হয়েছে বিজেপি, রাষ্ট্রীয় সয়ং সেবক সংঘ, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, শিব-সেনা, বজরং দলের মত প্রতিক্রিয়াশীল দল গুলো। এই কিছুদিন আগেও ভারতে নবহিন্দুত্বের তেমন কোন সংঠিত রূপ ছিল না (৯)। তবে অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর ধর্মান্ধতার কারণে ভারতের আপামোর জনসাধারণের কাছে সন্নাসী, গেরুয়া, জটা, দন্ড, রুদ্রাক্ষ, কমন্ডুলু এসব দীর্ঘকাল ধরে একটা বিমূঢ় সম্ভ্রম ভোগ করে এসেছে। ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের মোহের কথা ধুরন্ধর রাজনীতিবিদরা জানে। এই ধর্মীয় ভাবালুতা কে উস্কে দিতেই বোধহয় ১৯৯৮-৯০ সালে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় দুরদর্শনে ধর্মীয় অবয়বে প্রচারিত হল রামায়ন আর মহাভারত। সরকারী প্রচার মাধ্যমে এভাবে অন্ধ বিশ্বাসকে উৎসাহ দেবার ফলে ভারতে মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দুয়ার উন্মোচিত হল, রোপণ করা হল এক বিষ-বৃক্ষের চারা। দূর-দর্শনের পর্দায় প্রথমবার রামায়ণ চলাকালে কল্পিত রাম জন্ম-ভূমি নিয়ে মৌলবাদী আন্দোলনের জোয়ার এবং পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর উত্থান সেই প্রক্রিয়ারই অংশ। কিছুদিন আগে গুজরাটে ঘটে গেল স্মরণকালের মধ্যে সবচাইতে ভয়াবহ দাঙ্গা। ধর্মের মায়াজালে পড়ে সাধারণ মানুষ কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে আর নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে - গুজরাটের সাম্প্রতিক দাঙ্গা তার প্রমাণ। তারপরেও হুদা সাহেবরা কিন্তু ধর্ম বলতে অজ্ঞান !

হিউম্যানিস্টরা কেন ধর্মগ্রন্থগুলোর সমালোচনা করেন? সমালোচনা করেন কারণ তা সমালোচনার যোগ্য, তাই। কোন কিছুই তো আসলে সমালোচনার উ র্ধ্বে নয়- তা সে অর্থনীতি বা পদার্থবিজ্ঞানের নতুন কোন তত্ত্বই হোক, বা আল্লাহর 'মহান' বাণীই হোক। সমালোচনার একটি বড় কারণ হল, ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে বিরাজমান নিষ্ঠুরতা। ধর্মগ্রন্থগুলি তো আর গীতাঞ্জলি বা সঞ্চিতার মত নির্দোষ কাব্যসমগ্র নয় যে অবসর সময়ে শুয়ে শুয়ে কাব্য চর্চা করলাম আর তারপর আলমারীর তাকে তুলে রেখে দিলাম ! ধর্মগ্রন্থগুলিতে যা লেখা আছে তা ঈশ্বরের বাণী হিসেবে পালন করা হয় আর উৎসাহের সাথে সমাজে তার প্রয়োগ ঘটান হয়। আবিদ সাহেবরা কি কখনও ভেবে দেখেছেন বেদের সতীদাহকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এক সময় কত হাজার হাজার বিধবাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে? আবিদ সাহেবের অবগতির জন্য জানাই, শুধুমাত্র ১৮১৫ সাল থেকে ১৮২৬ সালের মধ্যে সতীদাহের স্বীকার হয়েছে ৮১৩৫ জন জন নারী। এই তো সেদিনও - ১৯৮৭ সালে রূপ কানোয়ার নামে একটি মেয়েকে রাজস্থানে পুড়িয়ে মারা হল 'সতী মাতা কী জয়' ধ্বনি দিয়ে। সারা গ্রামের মানুষ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল - কেউ টু শব্দটি করল না। আর করবেই বা কেন? ধর্ম রক্ষা করে হবে না? মহাভারতের কথা শুনলে যেমন পূণ্য হয়, সতী পোড়ানো দেখলেও নাকি তেমনি। ধর্ম যে কি কিরকম নেশায় বুদ করে রাখে মানুষকে, তার জলজ্যান্ত প্রমান এই সতীদাহ। এ জন্যই বোধ হয় Pascal বলেছেন - Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction." খুবই সত্যি কথা। চিন্তা করুন ব্যাপারটা - জীবন্ত নারী মাংস জ্বলছে, ছটফট করছে, অনেক সময় বেঁধে রাখতে কষ্ট হচ্ছে, মাঝে মাঝে পালাতে চেষ্টা করছে - আফিম জাতীয় জিনিস গিলিয়ে দিয়ে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে আবার চিতায় তুলে দেওয়া হচ্ছে - কী চমৎকার মানবিকতা (১৩)! ইসলামী বিশ্বে সরিয়ার শিকার হয়ে প্রতিদিনই প্রাণ হারাচ্ছে অসহায় সাফিয়া, আমিনারা। কোরাণের আয়াত উদ্ধৃত করে কাফিরদের বিরুদ্ধে রোজই যুদ্ধের হাঁক পাড়ছে বায়তুল মোকারমের 'বিখ্যাত' খতিব। তবুও নেশায় বুদ হয়ে ইসলামের মধ্যে 'শান্তি', 'প্রগতি' আর 'সহিষু-তা' খুঁজে চলেছেন ফরিদ আর হুদা সাহেবরা। আমি আসলে বিন-লাদেন, মোল্লা ওমর, খোমেনি বা মৌলানা মান্নানের মত লোকদের তেমন একটা দোষ দেই না; অন্ততঃ তারা কথায় আর কাজে এক। আল্লাহ কোরাণে যে ভাবে যে ভাবে বলেছেন, ঠিক সেভাবেই কোরাণের আদর্শকে সামনে রেখে তারা কাজ করে চলেছেন। আমি আসলে দোষ দেই ফরিদ, হুদা আর আবিদ সাহেবদের মত 'শিক্ষিত' মুসলিমদের যারা কোরাণের মধ্যে সহিষু-তা খুঁজে পান আর চারিদিকে এত অশান্তি দেখেও 'ইসলাম শান্তির ধর্ম' বলতে বলতে মুখে ফ্যানা তুলে ফেলেন। আবিদ সাহেব হয়ত বলবেন বিন-লাদেনরা কোরানের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন, অপব্যবহার করেছেন। কিংবা হয়ত 'কোরানের সূর্যাস্তের বর্ণনার' মত বলবেন কোরাণে জিহাদের ব্যাপারটা পুরোটাই রূপক - আল্লাহ আসলে কাফির মারার কথা ওইভাবে কোথাও বলেন নি! ভন্ডামির একটা সীমা থাকে। আজ আবিদ সাহেবের মত হিটলারের অনুসারীরা যদি দাবী করে বসে যে হিটলার আসলে ইহুদীদের কখনই মারতে চান নি, হিটলারের 'ইহুদী নিধন' এর ব্যাপারটা ছিল পুরোটাই রূপক। নাৎসীরা খামাখাই হিটলারের

কথার ভুল-ব্যাখ্যা বা অপব্যখ্যা করে এতগুলো মানুষকে মারলো! অথবা বেদে বর্ণিত 'চিতার আগুন' বলতে ভগবান আসলে 'মনের আগুন' কে বুঝিয়েছেন। সতীর ব্যাপারটা আসলে ছিল রূপক। হিন্দুরা বোঝেনি। আবিদ সাহেব কি এই ধরনের হাস্যকর ব্যাখ্যা মেনে নেবেন? যেখানেই তারা গোঁজামিল দিয়ে কোরাণকে ব্যাখ্যা করতে পারেন না, তাদের দৃষ্টিতে তা হয়ে যায় রূপক ! স্বর্গ রূপক, নরক রূপক, গোর-আজাব রূপক, ফেরেস্তা রূপক, হিলা রূপক, জিহাদ রূপক, মেরাজ রূপক, সাত আসমান রূপক, সমতল পৃথিবীর বর্ণনা রূপক; সবই যখন রূপক, তখন পুরো কোরাণটিকে আর অদৃশ্য আল্লাহতালাকে 'রূপক' ঘোষণা করতে অসুবিধা কোথায়? মানবতার স্বার্থেই তা প্রয়োজন।

৩

আজ আধুনিক রাষ্ট্রগুলির দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, আল্লাহর গুনার দোহাই দিয়ে মানুষ জনকে সৎ পথে পরিচালিত করার ব্যাপারটি কি নিদারুনভাবে ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হয়েছে। আল্লাহর গুনার ভয় দেখিয়েই যদি মানুষ-জনকে পাপ থেকে বিরত রাখা যেত, তা হলে আর রাষ্ট্রে পুলিশ-দারোগা, আইন-কানুন, কোর্ট-কাচারি কোন কিছুর ই আর প্রয়োজন হত না। হুদা সাহেবরা হয়ত বলবেন যে, অভিজিৎ রায়ের মত নাস্তিক লোকজন রাষ্ট্রে আছেন বলেই পুলিশ দারোগার প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের পরিসংখ্যান তো অন্য কথা বলছে। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি ১৯৮৮ সালে ভারতের জেলখানায় দাগী আসামীদের মধ্যে একটি জরিপ চালিয়েছিল। জরিপের যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল, তা ছিল অবাক করার মত। আসামীদের শতকরা ১০০ জনই ঈশ্বর এবং কোন না কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী (১০)। আজ বাংলাদেশে জরিপ চালালেও একই ধরনের ফলাফল পাওয়া যাবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, বেহেস্তের লোভ বা দোজখের ভয় কোনটাই কিন্তু অপরাধীদের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারেনি। আল্লাহর গুনার ভয়েই যদি মানুষ পাপ থেকে, দুর্নীতি থেকে মুক্ত হতে পারত, তবে তো বাংলাদেশ এতদিনে বেহেস্তে পরিনত হত। কিন্তু বাংলাদেশের দিকে তাকালে আমরা আজ কী দেখছি? বাংলাদেশে শতকরা ৯৯ জন লোকই আল্লা-খোদা আর পরকালে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও দুর্নীতিতে এই দেশটিই আজ পৃথিবীর শীর্ষে। ধর্মে বিশ্বাস কিন্তু দেশবাসীকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পারেনি। পারবেও না। যে দেশে সর্বোচ্চ পদ থেকে বইতে শুরু করে দুর্নীতির স্রোত, যে দেশে গোলাম ফারুক অভি, এরশাদ, ফালু, গোলাম আজম, নিজামী, হাজি সেলিম, জয়নাল হাজারীর মত হত্যাকারী, ধর্ষক, গুন্ডা, ছিনতাইকারী, ডাকাত রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকার দরুন শুধু রেহাই ই পায় না, বরং বুক চিতিয়ে ঘুরে বেরাবার ছাড়পত্র পায়, নেতা হবার সুযোগ পায়, সে দেশের মানুষ নামাজ পড়েও দুর্নীতি চালিয়ে যাবে; তারা রোজাও রাখবে, আবার ঘুষও খাবে। তাই হচ্ছে। এই তো ধর্মপ্রাণ, আল্লাহ-খোদায় বিশ্বাসী বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা। অপরদিকে সিঙ্গাপুরের দিকে তাকানো যাক। এ দেশটিতে শতকরা ৮০ জন লোকই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মপরিচয় থেকে মুক্ত। ধর্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তারা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে -'ফ্রি থিঙ্কার'। অথচ, ধর্ম নয়, শধু আইনের শাসন আর সামাজিক মূল্যবোধগুলির চর্চা করে সিঙ্গাপুর আজ পৃথিবীর সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলির একটি। অধিকাংশ সিঙ্গাপুরবাসীরা আল্লা-খোদার নামও করেন না, নরকের ভয় অথবা বেহেস্তের লোভও তাদের নেই। কোন যাদুবলে তারা দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকছে হুদা সাহেবরা কি জবাব দেবেন?

উপরের পরিসংখ্যান গুলো দেওয়ার উদ্দেশ্য এটা প্রমান করা নয় যে, মানুষ নাস্তিক হলেই ভাল হবে, বরং এটাই বোঝানো যে, ধর্ম কোনভাবেই নৈতিকতার 'মনোপলি ব্যবসা' দাবী করতে পারে না। আসলে কোন বিশেষ ধর্মের আনুগত্যের উপর কিন্তু মানুষের নৈতিক চরিত্র-গঠন নির্ভর করে না, নির্ভর করে একটি দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আর সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর।

আমি আমার প্রবন্ধটি শেষ করতে চাই একটি নস্তিক ভারতীয় দম্পতির চলমান স্রোতের বিপরীতে নিরন্তর সংগ্রামের কথা বলে। তাদের ঘটনাটি মুক্তমনায় প্রকাশিত হয়েছিল, প্রকাশিত হয়েছিল ভারতের বেশ ক'টি পত্র-পত্রিকায়। শ্রীমতি তাহমিনা খাতুন আর তার স্বামী শ্রী সুকুমার মিত্র। ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাস নাগাদ সুন্দরবনে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে এই দম্পতি ২৪ পরগনার নাজাত এর 'হোটেল পান্থনিবাসে' এক রাত থাকবার জন্য যান। হোটেলের ম্যানেজার তাঁদের ঢুকতেই দিল না। স্পষ্ট অবিশ্বাসের সুরে জানালো, 'একজন খাতুন কি করে একজন মিত্রের স্ত্রী হয়?' তাঁরা তখন বাধ্য হয়ে ম্যানেজার সাহেবকে নিজেদের বিয়ের সার্টিফিকেট দেখালেন। তবু ম্যানেজার সাহেব নির্দেশ দিল তাহমিনাকে পদবী হিসেবে 'মিত্র' লিখতে হবে। তাহমিনা-সুকুমার কেউই এতে রাজী হলেন না। আর কেনই বা হবেন, তারা তো হিন্দু বা মুসলিম পরিচয়ে নিজেদের অভিহিত করেন না। তারা বললেন - 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান নই, আমরা মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করি এবং মনে করি এটি কোন অপরাধ নয়।' কিন্তু ম্যানেজার সাহেবের হৃদয় তাতে গলেনি। তিনি তাঁদের হোটেল ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ক্ষুব্ধ, অপমানিত এই দম্পতি ব্যাপারটিকে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও জেলার পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্টের নজরে আনেন; এমনকি কনজিউমার্স কোর্টে যাওয়ার কথাও ভেবেছিলেন তারা। (১১)

এধরনের ব্যাপার অবশ্য তাদের জীবনে এই প্রথম নয়। হাবড়ার গান্ধী সেন্টিনারি বি টি কলেজে বি এড পড়ার জন্য একসময় তাহমিনা খাতুন আবেদন করেছিলেন। তাঁর যোগ্যতা অনুসারে তিনি ছিলেন ৮৮০ জন আবেদনকারীর মধ্যে প্রথম। কিন্তু তিনি আবেদনপত্রে নিজেকে মুসলিম হিসেবে চিহ্নিত করেননি। শুধুমাত্র এই অপরাধে তাঁকে কলেজে ভর্তি করা হল না। তিনি বারাসত আদালতে মামলা করলেন। কোর্টের রায় হল তার অনুকূলে। স্পষ্ট বলা হল, এভাবে ভর্তি না করার ব্যাপারটি একজনের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ এবং কলেজ কর্তৃপক্ষকে তাঁকে ভর্তি করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। কিন্তু আদালতের নির্দেশ মানা হল না, তাহমিনাকে ভর্তি করা হয়নি। তাহমিনা আদালত অবমাননার অভিযোগ তুলে আদালতে আবার আবেদন জানিয়েছিলেন। এবং শেষ অব্দি অনেক দেরীতে তাঁকে প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়া হল-কিন্তু তখন তাঁর চাকরী করার বয়স পেরিয়ে গেছে।

কিন্তু এই ক্রমাগত নিগ্রহ আর নির্যাতনের মুখে দাঁড়িয়েও তাঁরা মনোবল হারাননি। 'হয়ত সারা জীবন ধরেই এসবের মুখোমুখি আমাদের হতে হবে, তবু আমরা লড়াই থেকে পিছু হটতে চাই না, কারণ, শেষ অব্দি আমাদের জয় হবেই' - এই ছিল তাঁদের দ্বিধাহীন উত্তর (১২) ।

তাহমিনা আর সুকুমারদের মত সংগ্রামী 'অন্ধ আর বর্বর' দের নিয়েই গড়ে উঠুক আগামী বিশ্ব। সেই দিনের প্রত্যাশায়-

অভিজিৎ।
২৭/০১/২০০৩

{ধর্ম নিয়ে আর ধর্মগ্রন্থ নিয়ে এই আপাততঃ আমার শেষ উত্তর। আমি যখন এই প্রবন্ধটি লিখছি তখন, বাংলাদেশে বহু শীতার্ত মানুষ নিরন্তর 'একটু উষ-তার জন্য' যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আমি আশা করব ধার্মিক-অধার্মিক নির্বিশেষে সবাই মানবতার খাতিরে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেন। যাদের ক্রেডিট কার্ড আছে তারা 'দৃষ্টিপাত' (http://www.drishtipat.org/appeal/ushnota.html)এর মাধ্যমে সাহায্য করতে পারেন। যারা বাংলাদেশে থাকেন, অথবা যাদের ক্রেডিট-কার্ড নেই কিন্তু সাহায্যের জন্য ইচ্ছুক, তাদের জন্য কিছু ঠিকানাঃ

মুক্ত-মনা (৬৫-৬৮৭৪ ৪৫০৯, ৮৮০-২-৯৩৫০৯০৭, ১-১৪১৬৭৪২৫৯৭৫)
অপরাজেয় বাংলাদেশ (৮৮০-২-৮১১৫৭৯৮)
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (৮৮০-২-৮৩১৫৮৫১)
ছিন্নমূল শিশু-কিশোর সংস্থা (৮৮০-২- ৯৫৬৫৩৪৩)
অ্যারাইজ (৮৮০-২-৮১২৪০৯২)
পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র (৮৮০-২-৯১১২৩২৫)}

তথ্য সূত্রঃ

১। নাস্তিকতার সংজ্ঞা, সুমন তুরহান। দেশ ৪ নভেম্বর, ২০০২।
২। অলৌকিক নয়, লৌকিক, প্রথম খন্ড, প্রবীর ঘোষ ।
৩। কোরান শরীফ (বঙ্গানুবাদ), মাওলানা খান মুহাম্মদ ইউসুফ আবদুল্লাহ, সোলেমানিয়া বুক হাউস।
৪। Call to Muslims of the World : A Message from Faith Freedom International.
৫। The Holy Quran, Translation by Abdullah Yusuf Ali, Goodwords Books 2001.
৬। TERRORIST AND INSURGENT ORGANIZATIONS, Air University Library Publications.
৭। My Religion, Avijit Roy, http://humanists.net/avijit/article/my_religion_avijit.htm
৮। আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, প্রবীর ঘোষ, দে'জ প্রকাশনী, ১৯৯৬।
৯। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, সুকুমারী ভট্টাচার্য, দীপ প্রকাশন, ২০০০।
১০। অলৌকিক নয়, লৌকিক, তৃতীয় খন্ড, প্রবীর ঘোষ, পৃঃ ৩৯।
১১। মুক্তমনা, www.mukto-mona.com
১২। নাস্তিক হওয়ার অপরাধে, ভবানী প্রসাদ সাহু, দীপ প্রকাশন, ২০০০।
১৩। সতীঃ একের আনলে বহুরে আহুতি, ভাস্বতী চক্রবর্তী, দেশ ৪ জানুয়ারী, ২০০৩।